International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-II, March 2025, Page No. 204-212
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i2.019

সমাজ সংস্কার, ধর্ম ও দর্শনে রাজনারায়ণ বসু

ড. টুসি ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received 03.03.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sage Rajnarayan Basu was one of the renowned persons among other great men in the middle stage of nineteenth century of Bengal. He was encouraged by his father to work for his country. His various articles, books like 'Se Kal aar E Kal', 'Bangabhasa', etc. proved his patriotism. He had supported the reform revolution of widow marriage by Vidyasagar.

Rajnarayan Bose was a realistic and truth lover. He thought that European culture is destroying our Indian culture. He wants to create the format of Indian culture according to the idea of ancient societal culture. He thought that as we find an eternal truth in religion of India, hence we don't need any change in the Indian culture. He shows that Gautama Buddha was able to change in Indian social culture; Sankaracharya, Ramananda, Kabir, Nanak, etc. also were able to change various culture, customs, moves etc. of Hindu society. He had also tried to make social changes through the publicity of Brahmavāda in Indian culture. He was influenced by the reading of Vedas, Upanishads and Western Philosophy. He has tried to free our nation and Hindu religion from Christian religion and culture. He feels that it is very necessary to remain a scriptural book of Hindu religion like other religions. In this regard, he wants to translate the language from Sanskrit to Bengali of all the Hindu or Brahma scriptures. He realizes that we have to purify our mind if we want to realize the God. It will be possible only through the self-restriction through the practice of Yoga. He thinks that which religion holds scientific explanation, philosophical truth, that religion must be established. We find an excellent mixture of Jnanayoga, Bhaktiyoga, Karmayoga in his religious thought. He advices us to follow the religion in every cases like education, society, politics, etc.

Keywords: *Religion, God, Brahmasamaj, Rajnarayan Basu, social revolution.*

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গসমাজ যখন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে নিবিষ্ট, সেই সময়ে জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে যে সব মণীষী আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ঋষি রাজনারায়ণ বসু অন্যতম। ১৮২৬ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বোড়াল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রামমোহন রায়ের শিষ্য। সেটিই ছিল রাজনারায়ণ বসুর স্বদেশপ্রীতির প্রধান উৎস। যা পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আরো বর্ধিত হয়েছিল। মাতৃভূমির প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তিনি দেশোন্নয়ন ও

জনহিতকর নানা কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জনশিক্ষার সুবিধার্থে তিনি পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শ্রমজীবীদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও মিউচুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটি, জ্ঞানদায়িনী সভা, নিবারণী সভা, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা ইত্যাদি তাঁরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলির প্রভাব পরবর্তীকালে সারা বঙ্গে বিস্তার করেছিল। তাঁর এই সকল কর্ম বঙ্গের জাতীয়তা উন্মেষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এমনকি তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর সব কর্মপদ্ধতির মূলে ছিল দেশের মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করা। তাঁর লেখা *সে কাল আর এ কাল, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থ এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধগুলি লিখতেন তার মধ্যে দিয়ে তাঁর স্বদেশ প্রীতিরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজসংস্কারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। নারীজাতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি বিভিন্ন ধারায় উৎসারিত হয়েছিল, এমনকি বিপথগামী হীন ব্যবসায় লিপ্ত নারীদের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এইভাবে তাঁর বিভিন্ন কর্ম ও চিন্তাধারার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তিনি একজন প্রকৃতই সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর সমাজ সংস্কারের আদর্শ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনি ছিলেন সত্যের প্রতি অনুরাগী এবং বাস্তববাদী। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ— যেকোনো বিষয়েই তিনি ধীর পন্থায় পরিবর্তন চেয়েছিলেন। সমাজচিন্তায় তাঁর মন ছিল যুক্তির প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত। কোনো রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেনি। তিনি দেশ ও সমাজের গোড়ার ত্রুটির কথা চিন্তা করেছিলেন। সেই সময় ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইউরোপীয় অভাব, প্রয়োজন, বিলাসিতাও এসেছে। তার জন্য ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টভাবে অবলম্বন করা হচ্ছে না বলে তিনি মনে করেছেন। 'সে কাল আর এ কাল' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন লোকের ভাবনা বৃদ্ধি, তাদের আয়ু ও শারীরিক বল ক্ষয়ের একটা প্রধান কারণ। এইভাবেই একটা জাতির জীবন অন্য একটা জাতির প্রভাবে সর্বভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। বাঙালি জাতির অনুকরণের প্রবৃত্তি জেগেছিল, ফলে জাতির জীবনে অসংযম ও অসৌজন্য দেখা দিয়েছিল।

প্রগতিবাদী রাজনারায়ণ বসু সমগ্র ভারতের জীবনাদর্শ গঠন করতে চেয়েছেন প্রাচীন সনাতন সমাজব্যবস্থার আদর্শ অনুসারে। তিনি মনে করেছিলেন ভারতবর্ষে ধর্মের মধ্যে যেমন একটা শাশ্বত সত্য আছে, ভারতের সমাজব্যবস্থায় তেমন পরিবর্তনের ব্যাপকতা নেই। তিনি দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব সামাজিক রীতিনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন, শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতবাদ দিয়ে আর্যসমাজকে আলোড়িত করেছিলেন, রামানন্দ, কবীর, নানক এঁরা সকলেই হিন্দু সমাজের নীতি-নিয়মের বহু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসুও ব্রহ্মবাদ প্রচারের দ্বারা সমাজমানসের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল সমাজসংস্কারের মূল প্রেরণা থাকবে ধর্ম চেতনায় এবং লক্ষ্য থাকবে স্বাদেশিকতায়। তাঁর সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে এই ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি প্রাচীন প্রথাকে রক্ষা করেই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজ সম্পাদন করে যেতে চেয়েছিলেন। 'ঋষিজীবন' নামক প্রবন্ধে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিরা গার্হস্থ্য ধর্মের মধ্যে বাস করেও সমাজ কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন সেই ঋষিদের জীবনধারণ প্রণালীকেই তিনি আদর্শ সমাজব্যবস্থা বলে মনে করেছিলেন।

শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও রাজনারায়ণ প্রাচীন রীতির অনুগামী ছিলেন। প্রাচীন ঋষিদের শিষ্যেরা যে সহিষ্ণুতা, বিনম্রতা, শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় দিয়েছে, পরবর্তীকালের ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সকল গুণাবলী দুর্লভ হয়ে উঠেছে বলে রাজনারায়ণ বসু বেদনা অনুভব করেছেন। ঋষির তপোবনে বা গুরুগৃহে যে ধর্মভিত্তিক, চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা ছিল, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক্ এই মনোভাব তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন। পূর্বে শিক্ষার্থীরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুগৃহে বসবাস করে বিদ্যাধয়ন করত এবং সেই সময় তাদের কঠোর নিয়ম পালন করে চলতে হত — এই সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মনে করেছেন এই নিয়মের মুখ্য

উদ্দেশ্যই ছিল ছোটো থেকেই কষ্টসহিষ্ণুতা, বিনম্রতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, অভ্যাস। এইজন্যই বোধহয় প্রাচীন ভারতে এত শূর বীর উৎপন্ন হয়েছিল। এছাড়াও তাঁর মনে হয়েছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালী সেই সময়কার সমাজজীবনের উপযোগী ছিল। শিক্ষা বলতে তিনি কিন্তু পুথিগত বিদ্যার কথা বলেননি, যে শিক্ষায় মানুষের দেহের ও মনের উৎকর্ষ সাধন হয়, এমন শিক্ষাব্যবস্থাই তাঁর কাম্য ছিল।

আশ্রমিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতির পর তিনি টোল ও গুরুমশাইয়ের পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। ঐ সমস্ত টোল এবং পাঠশালায় সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া হত, এমনকি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠত। সেই সময় শিক্ষকরা ছাত্রদের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। ফলে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তিগুলিরও সুষ্ঠ বিকাশ হত। কিন্তু যখন এই দেশে ইংরাজি স্কুলগুলি স্থাপিত হল, তখন আস্তে আস্তে টোল ও পাঠশালা অবলুপ্ত হতে থাকল, এই ঘটনায় রাজনারায়ণ বসু অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। সহজপাচ্য বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে ইংরাজি ভাষার প্রবর্তন তিনি সমর্থন করতে পারেননি। অথচ বিদেশীরা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-পুরাণের নিবিড় চর্চা করছে। তাই তাঁকে খুব আক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছে।

সমাজের অন্যান্য দিকের প্রতিও রাজনারায়ণ বসুর সমান দৃষ্টি ছিল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তিনি গভীর ও আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছিলেন। মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রাপ্রণালী থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে শিক্ষার আলোয় তার জীবন আলোকময় ও প্রাণবন্ত করার পক্ষে কেবলমাত্র তখন রাজনারায়ণের প্রচেষ্টা ছিল না, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে এই প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর এই অভিমত— "হয় স্ত্রীদেরও রীতিমত শিক্ষা দাও, নতুবা শিক্ষা দেওয়ায় কাজ নেই"। প্রাচীন সমাজে এদেশীয় স্ত্রীলোকদের দশ-বারো বছর বয়সে কেবলমাত্র বর্ণপরিচয়, শব্দপরিচয় হওয়ার পরই শিক্ষায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যেত। সমাজের ঐ রীতি তাঁর কাছে অভিপ্রেত ছিল না। শিক্ষা মজ্জাগত না হলে তা স্ত্রীজাতির জীবন ও চরিত্রের আমূল সংস্কার সাধন করতে পারবে না। তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে সংসারের সর্বাঙ্গীণ শোভনবস্তু নারীদের কাছেই প্রাপ্য।

সমাজে নারীজাতির স্থান কেমন হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে তাঁর অভিমতগুলিও 'সমাজ-সংস্কার' নামক প্রবন্ধে ও কয়েকটি পত্রে লক্ষ্য করা যায়। নারীর সতীত্ব রক্ষার প্রণালীকে তিনি হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি বলে দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে ভারতীয় সমাজ বিবাহপ্রথার দ্বারা সুসংবদ্ধ হয়েছে। তাই বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা রক্ষাই স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার উপায় বলে তিনি মনে করতেন। তবে তিনি কখনই বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সমাজের বিপথগামী, হীন ব্যবসায় লিপ্ত নারীদের প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৬৯ সালের ২১ এপ্রিলের একটি পত্রে। ১৮৬৪ সালের ১৬ নং আইন প্রযুক্ত হওয়ায় তিনি খুব আনন্দিত হন এবং সরকারকে অজস্র সাধুবাদ জানান। সরকারের কাছে তাঁর আবেদন ছিল যে, সরকার যেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে এই সব ভাগ্যহতদের কথা বিবেচনা করেন।

সমাজে জাতিভেদ প্রথাকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে লিখিত দুটি প্রস্তাবে তিনি জাতিভেদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। সমগ্র সমাজের কর্ম যেমন যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিভক্ত, তেমনি সমাজে সমাজরক্ষার প্রয়োজনেই জাতিভেদ অনিবার্য। তবে জাতিকে বিভক্ত করার পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয় সমাজে বংশানুক্রমিক জাতিভেদ থাকায় প্রতিভাবান, বিদ্বান, ত্যাগশীল, ক্ষমাপরায়ণ শ্রেণির সুদীর্ঘ প্রবাহ সম্ভব হয়েছিল। তবে এই প্রথাতেও তিনি কিছুটা হলেও দোষ দেখেছিলেন। কারণ উচ্চবর্ণ ব্যক্তি জ্ঞানহীন ও দুশ্চরিত্র হলে শুধু বর্ণের গুণে সম্মান পাবে, সমাজে এরূপ ব্যবস্থা কখনই থাকা উচিত নয় বলে তিনি মনে করেছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু বিবাহে সংকর প্রথা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। এর দ্বারা সমাজে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংখ্যা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। তাঁর মনে হয়েছে এর ফলে দেশ উপকৃত হবে, জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত হবে, শারীরিক বলবীর্যে

বাঙালি বলীয়ান হবে। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে ছিলেন। তাঁর দুজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিয়েছিলেন দুই বাল্যবিধবার সঙ্গে।

রাজনারায়ণ বসুর সমাজদর্শনের কেন্দ্রে ছিল গভীর মানবপ্রীতি তথা জনগণের সর্বৈব মুক্তির চিন্তা, তাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ থেকেই এই ভাবনার উৎস। এই কারণেই তিনি ধর্মগত, জাতিগত সমস্ত বিভেদ, বৈষম্য দূর করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারা অনুসরণে সব বিরোধের উর্ধ্বে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমাজবদ্ধ জাতির সমাজবোধের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধের স্ফূরণ হয়। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জাতীয়ভাব মিশে থাকে এবং সমাজের মধ্যে তা বিকীর্ণ হয়ে মানুষকে কর্মচঞ্চল করে তোলে। রাজা রামমোহন রায় জাতীয় চৈতন্য জাগ্রত করবার জন্য হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব জাতির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। আত্মীয় সভা, অ্যাংলো হিন্দু স্কুল, ব্রহ্মসভাকে কেন্দ্র করে তিনি বাঙালি জাতিকে আত্মসমীক্ষণের সুযোগ দিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরাজি সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এঁরাই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বাঙালিকে স্বদেশ সম্পর্কে অবহিত করে তোলে এবং সমগ্র জাতির মনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেন। এই মহৎ কর্মে রাজনারায়ণ ছিলেন বিশেষ অগ্রণী। জাতীয়তাবোধ উন্মেষের প্রচেষ্টায় তাঁর দান ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর জাতীয়তাবোধের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে জাতীর জীবনে স্বদেশচর্চার বৈশিষ্ট্যটি আলোচনা করতে হয়। স্বদেশচর্চার প্রাথমিক স্তরে প্রায়ই জাতিবৈর মনোভাব দেখা যায়। জাতীয়তাবোধের যাঁরা উদ্‌গাতা তাঁদের চরিত্রেও এই লক্ষণ দেখা যায়। তিনি জাতিকে পূর্বগৌরব সম্বন্ধে সচেতন, বর্তমান হীনাবস্থা সম্বন্ধে অবহিত এবং ভবিষ্যত উন্নতির পথ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর শুভ উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রেরণাস্থল ছিল রামমোহন রায় এবং কর্ম উদ্দীপনার ক্ষেত্র হয়েছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করেই রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধের আদর্শটি একটি সুস্পষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল। সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির মতন তাঁরও স্বদেশপ্রেমের আবেগ জেগেছিল। স্বদেশ চেতনার আগুন অতি অল্প বয়সেই তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছিল। যা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যে তাঁর জাতীয়তাবোধের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

খ্রিস্টধর্মের প্রতি হিন্দুজাতির আকর্ষণ লক্ষ্য করে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের মতন, রাজনারায়ণ বসুও দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। তিনিও হিন্দুজাতির চরিত্রগত বিশেষ প্রবণতার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দুজাতির মতন ধর্মপরায়ণ ও ভাবপ্রবণ জাতি বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাই তিনি চিন্তা করেছিলেন এই জাতির জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হলে স্বধর্মে শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনা হবে প্রথম কর্তব্য। সেইজন্য হিন্দুজাতির ধর্মের মহিমা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাই তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল হিন্দুজাতির ধর্মসংশয় দূর করে, আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনা ও তাকে জাতিত্বে প্রতিষ্ঠা করা। সর্বোপরি সকল ধর্মের মূল সত্য ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দুধর্মের মধ্যেই নিহিত একথাও তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও হিন্দু উপাধি কোনোদিন বর্জন করেননি।

রাজনারায়ণ বসু বারবার বিভিন্ন রাজাদের কীর্তিকলাপ স্মরণ করেছেন। জন্মভূমির প্রতি সম্ভ্রমবোধেই রাজনারায়ণ জাতির কীর্তিবিশ্রুত ঐতিহ্য নিদর্শন জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি উপনিষদ ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন। মহাভারতে বর্ণিত জাতির সভ্যতা ও শৌর্যবীর্যের কাহিনির সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য মহাভারতের নির্বাচিত অংশের ইংরাজি অনুবাদের সূচনা করেছিলেন। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে সমস্ত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে তিনি জাতির গৌরব বৃদ্ধি করতে সেগুলিরও ইংরাজি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। অনুবাদ ও মৌলিক রচনায় ইংরাজি ভাষা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি

গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে দেশীয় সম্পদের পরিচয় দিয়ে জাতীয় চৈতন্য উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছিলেন।

জাতীয় ঐতিহ্যে বাঙালি জাতিকে সচেতন করতে রাজনারায়ণ বসুর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। তিনি 'রামের জন্মবৃত্তান্ত' রচনা করে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে 'নরচন্দ্রমা' রামের কীর্তিকথা ঘোষণা করেছেন, 'সে কাল আর এ কাল' রচনা করে একালের তুলনায় সেকালের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। বৈদিক ঋষিদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ঐ প্রণালীর উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন 'ঋষি জীবন' প্রবন্ধে এবং 'গীতা মাহাত্ম্য' রচনা করে কর্মবিমুখ বাঙালিকে কর্মমন্ত্রে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি মনে প্রাণে আশা করেছিলেন যে, দেশের অতীত কীর্তিগাথা অনুধ্যানের দ্বারা বাঙালি জাতি যেমন জাগরিত হবে, তেমনই বাংলা তথা সমগ্র ভারতের গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাস কাহিনি জাতির জাতীয়তাবোধ জাগরণে সহায়ক হবে। বিদেশী ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য ও স্বদেশী ইতিহাস জানার উদ্যমহীনতার প্রবণতায় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি 'আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার', 'আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত' এইসব প্রবন্ধ রচনা করে 'প্রাচীন আর্যজাতির সঙ্গে হিন্দুজাতির ঐক্য' তাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের আদর্শ, তাদের ভাষাতাত্ত্বিক বিবরণ, ইত্যাদি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আবার 'মিশর দেশ' নামক প্রবন্ধ রচনা করেও অন্য জাতির জীবনাদর্শ, স্বজাতির সামনে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন।

জাতি প্রতিষ্ঠার মূলে মাতৃভাষার কার্যকারিতার কথা রাজনারায়ণ বসু অপরিণত বয়সেই গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার স্মরণার্থ সভার বক্তৃতাটিই তার উপযুক্ত প্রমাণ। তিনি শেলিং, হেগেল প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ, দার্শনিকদের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ জাগরণে ভাষার অপরিহার্য শক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তবে ইংরাজি ভাষা উচ্ছেদ হয়ে বাংলা ভাষা প্রচলিত হোক এমন কথা তিনি কখনো বলেননি।

রাজনারায়ণ বসু মনে করতেন, যদি বাঙালি চল্লিশ বছর বাঁচে, তার অর্ধেক জীবন যদি একটা বিদেশী ভাষা শিখতে চলে যায়, তাহলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাঁর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনায়। তিনিও বলেছেন ইংরাজি ভাষা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা, একথা দৃঢ় কণ্ঠে বলে দেখিয়েছেন যে সেই সময় দেশে যে সংস্কৃতির চর্চা ছিল না, আদর ছিল না, বাংলা ভাষার চর্চা এমনকি শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল না, এই জন্য রাজনারায়ণ কত দুঃখ প্রকাশ করেছেন। রাজনারায়ণ 'স্বদেশীয় ভাষানুশীলন' প্রবন্ধে বাঙালির সম্মিলিত অনুষ্ঠানে দেশীয় ভাষার ব্যাপক প্রচলনের জন্য ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন।

'জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালি জাতি' নামক প্রবন্ধ দুটিতে রাজনারায়ণ জাতিগঠনের বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে নয়টি বিশেষ উপাদান দ্বারা একটি মানবগোষ্ঠী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। সেই উপাদানগুলি হল দেশ, শারীরিক লক্ষণ, মানসিক ও নৈতিক গুণ, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ, ভাষা ইত্যাদি। তবে বাঙালি জাতির পক্ষে জাতিগঠনের এই উপাদানগুলিকে আয়ত্ত্ব ও প্রয়োগ করা যে খুব সহজ একথা তিনি বুঝেছিলেন বলেই জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য বাঙালিজাতিকে বার বার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর দুটি অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করতে দুটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমত হিন্দু জাতিকে জাতিত্বে প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতব্যাপী অখণ্ড জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা। তবে স্বদেশ হিতৈষী রাজনারায়ণের সমধিক খ্যাতি ও কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে তার সংগঠনমূলক কর্মের মধ্যে। দেশহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বলেই, শিক্ষকতার মহৎ কর্ম ব্যতীত জীবনে অন্য কোনো কর্ম তিনি পেশারূপে গ্রহণ করেননি। দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করেই ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করে সঙ্গবদ্ধ আন্দোলন চালিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় সক্রিয় অনুষ্ঠান হল ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়

গৌরব সম্পাদনী বা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা। তাঁর অভিপ্রায় ছিল যে, এই সভা হবে সম্পূর্ণ স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান।

রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধের প্রবল উদ্দীপনা কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাঁকে 'সঞ্জীবনী' নামে এক গুপ্তসভার অধ্যক্ষরূপে দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এই সভার বর্ণনা আছে। এই সভার কার্যাবলীর কথা রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় সুস্পষ্ট। উনিশ শতকের সপ্তম দশকের নবজাগ্রত প্রাণ স্বদেশপ্রেমিকগণের কাছে দেশপ্রীতিই ছিল ইষ্টপ্রেম, স্বদেশচিন্তাই ছিল ইষ্ট আরাধনা। এই মন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান উদ্‌গাতা হলে রাজনারায়ণ বসু। তিনি তাঁর স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত না হলেও বিপ্লবের মূল আদর্শ ছিল গুপ্ত সভাতেই। যথোচিত অধিকার বজায় রাখতে ও ন্যায্য প্রাপ্যের জন্যই দেশবাসীর মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্রোহ ভাব জেগেছিল। তাঁর কথাতেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। *সে কাল আর এ কাল* পুস্তকে তিনি বলেছেন, "এই দেশে ইংরেজদের রাজত্ব স্থায়ী হয় আমরা ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের ইংরাজ রাজপুরুষরা আমাদের ন্যায্য আশা পূরণ করেন না।

রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধের আদর্শ ছিল উদার, ভৌগোলিক সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা তাঁর স্বদেশচেতনা কোনোদিন আচ্ছন্ন হয় নি। ভারতব্যাপী এক অখণ্ড হিন্দু জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার উচ্চ আদর্শেই তিনি তাঁর চিন্তার পরিধিকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। একদিকে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে আর্যসমাজ কর্তৃক বেদান্তধর্মের প্রচার দেখে হিন্দুধর্ম তথা হিন্দু জাতীয়তার বিলুপ্তি তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। এই সব কারণেই জাতীয়তাবোধ উদ্‌বোধনে রাজনারায়ণের প্রাদেশিকতার আদর্শ তাঁর স্বদেশচেতনারই আর এক দিক বলা যায়। প্রাদেশিক ভাব ও বিশ্বজনীন আদর্শ থেকেই তাঁর ভারতবোধ তথা বিশ্বমানবিকতা বোধ জেগেছিল। একেশ্বর ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাজনারায়ণ বসু ভারতব্যাপী এক জাতীয়তার মহান পরিকল্পনা করেছিলেন। মহামিলনের স্থানরূপেই তিনি 'মহাহিন্দু সমিতি' সংস্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু চেয়েছিলেন যে ভারতীয় সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র কোনোরকম বিভেদ বৈষম্য থাকবে না। রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচনার ক্ষেত্ররূপে রাজনারায়ণ কর্তৃক 'হিন্দু জাতীয় কংগ্রেস'এর সূচনা। দেশপ্রেমের আদর্শকে তিনি আজীবন সামনে রেখেছেন। দেওঘরের বিশ বছরের জীবনে তিনি কখনো সক্রিয়ভাবে, কখনো বা পত্র-প্রবন্ধাদির দ্বারাও তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি একসময় দেওঘরে একটি 'ভ্রাতৃ সমাজ' স্থাপনের সংকল্প করেন।

রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই ধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। সেইসময় বেদ, উপনিষদ এমনকি পাশ্চাত্যদর্শসমূহও তিনি নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করতে থাকেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিরন্তরভাবে আলোচনা করতে থাকেন। ফলে সেই সময়ে রাজনারায়ণের মনে বি।ভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে। শাস্ত্রজ্ঞানে ও অধ্যাত্মবোধে তিনি তরুণ বয়স থেকেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও জাতিকে খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে ব্যক্তিমনের পরিবর্তনের জন্য যে ভিন্ন একটি ধর্মের দ্বারা আঘাত দেওয়া হল সেই ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় হওয়া দরকার। এমনকি প্রত্যেক ধর্মের ধর্মগ্রন্থের মতো ব্রাহ্মধর্মেরও ধর্মপুস্তক থাকা আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের মূল বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এমনকি এর জন্য তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের মূল বিষয়বস্তু সংস্কৃত থেকে সরল বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ মুদ্রিত করতে। তিনি চেয়েছিলেন এই গ্রন্থের প্রথমভাগে শ্রুতি থেকে উদ্ধৃত ব্রাহ্ম বিষয়ক শ্লোকসমূহ থাকবে। গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে ব্রাহ্মধর্মমতকে সমর্থন করার জন্য হিন্দু, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং ইতিহাস থেকে ঈশ্বর বিষয়ক বিভিন্ন বচন উদ্ধৃত করা হবে। তৃতীয় তথা শেষ ভাগে প্রাচীন হিন্দুদের নীতিবিষয়ক বিভিন্ন শ্লোক সরল তাৎপর্য করে প্রকাশ করা হবে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের ষোলটি

অধ্যায়ের ছাপ্পান্নটি শ্লোক মনুসংহিতার মূল শ্লোকের মর্মানুবাদ করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এইভাবেই রাজনারায়ণের পরামর্শ, অনুপ্রেরণা, উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের সংস্কারের সময় আরো কিছু পরিবর্তন সাধনও করা হয়েছিল। কারণ রাজনারায়ণ বুঝেছিলেন সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিদিন একঘণ্টা করে উপাসনা পাঠের শিক্ষা দেওয়া অনেকটা ব্যতিক্রম পরিবেশ সৃষ্টি করে। এছাড়াও দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে যে নিয়মগুলো প্রবর্তিত হয়েছিল সেগুলি রাজনারায়ণের জীবনের অনুভূত সত্য। এছাড়াও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতিতে তিনি ভক্তিধর্মের প্রবেশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি প্রথম জীবনে কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকাও ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের জন্য রচনা করেছিলেন। রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত প্রচেষ্টায় এটি ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের অগ্রগতির পথে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। এইভাবে তাঁর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের আদর্শ লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মচিন্তায় ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। যা রাজনারায়ণ বসুর অধ্যাত্ম চিন্তাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক অল্প বয়সেই তাঁর মনে ধর্ম জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছিল। তিনি ছাত্রাবস্থাতে ডিরোজিও, রিচার্ডসন - এঁদের কাছে ইংরাজি সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র পাঠ করার সময়েই শিখেছিলেন জাতিকে কীভাবে সংস্কারমুক্ত রাখতে হয় এবং নিজের ধর্মমত কীভাবে স্থির করতে হয়। অর্থাৎ তিনি তখন থেকেই তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ইংল্যাণ্ডে আধুনিক দার্শনিক যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুরু ছিলেন ডেভিড হিউম। তাই সেই সময় ডেভিড হিউমের দার্শনিক চিন্তাও ছাত্রদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজনারায়ণ বসুও ছাত্রজীবনে হিউমের সংশয়বাদের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি খ্রিস্টধর্মের প্রতিও তাঁর লেখার মধ্যে অনুরাগের ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। এরপরে আবার তিনি মুসলমান ধর্মের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর জীবনে একের পর এক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। তবে দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে সংশয়বাদের একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকে। যুগে যুগে যত দার্শনিকের জন্ম হয়েছে তাঁরা সকলেই প্রায় সংশয়কে অনুভব করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু কোন এক সময় স্ত্রীর মৃত্যুর পর বেদনার মধ্যে থাকা অবস্থায় ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর অনিত্যতা কল্পনা করে তাঁর মন আধ্যাত্মিক সত্য জিজ্ঞাসায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই চিত্ত নিবিষ্ট করে রাখা উচিত। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মে ও চিন্তায় আছে ধর্মভাব। এখানে ধর্ম বলতে জগৎ, জীবন ও ব্রহ্মের প্রতি কর্তব্য সাধনই ধর্ম। তাঁর মতে ধর্মের অর্থ হল এমন এক পরম সত্তায় বিশ্বাস করা যিনি জগতের অতীত ও ঊর্ধ্বে সর্বজ্ঞ, পূর্ণ স্বভাব জগৎ ও জীবাত্মার ওপর যাঁর চরম কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং তাঁর ওপর আমরা একান্তভাবে নির্ভরশীল। সংসারে সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে যা একমাত্র মিলনের সেতু তাকে ধর্ম বলা যায়। ধর্মক্ষেত্রে তিনি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য করে দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে গিয়েছেন। তাঁর মতে একদেশের দুজন ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তার ফলে অসহিষ্ণু হওয়ার কোনো কারণ নেই। রাজনারায়ণ বসুর ধর্মচিন্তার এই অভিনব প্রকাশ উনিশ শতকের বাংলা দেশের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য।

রাজনারায়ণ বসু মনে করেছিলেন ব্রহ্মাই একমাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও মুক্তিদাতা। তিনি আত্মার আত্মা এবং তিনিই হলেন মানুষের নিকটতম আত্মীয়। তিনি মনে করেছিলেন যে শান্ত, সংযত অবস্থায় প্রেমোপলব্ধির দ্বারাই ব্রহ্মোপসনা করতে হবে। কেবলমাত্র তীর্থে তীর্থে - মন্দিরে মন্দিরে ঘুরলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরকে স্মরণ করে যার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, যার হৃদয়ে শিহরণ জাগে - সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত। রাজনারায়ণের অনুভূত সত্য হল এই যে ঈশ্বরের প্রেম পূর্ণিমার চন্দ্রালোকের মতই প্রাকৃতিক সকল বস্তুকে মনোরম আলোয় উদ্ভাসিত করে। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষের জীবনের সকল কর্মে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে তিনি

দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরই সকলের স্রষ্টা, অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় স্বরূপ। তিনি নিরাকার পদার্থ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি জগৎকে সৃষ্টি করলেও ক্লান্ত হন না। তিনি সক্রিয়, তিনি পরিচালক। তাঁর নিয়ম অনুসারেই এই জগতের সকল ঘটনা ঘটে, বাহ্যজগৎ ও মনোজগৎ উভয়েই নিয়মের অধীন। কারণ ছাড়া কার্য সম্ভব হতে পারে না। জগতের আদি কারণ হল ঈশ্বর। তিনি প্রীতির স্বরূপ। তিনি পিতা-মাতার স্বরূপ। তিনি মানুষকে শুভবুদ্ধি দেন। তিনি মানুষের প্রার্থনা পূরণ করেন। রাজনারায়ণ বসুর দর্শনচিন্তায় ঈশ্বরের নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব উভয়েই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ এই চিন্তা অনেকটা রামানুজের চিন্তার মতন। রাজনারায়ণ বসু মনে করেছিলেন ঈশ্বরের সংস্পর্শ লাভ করতে হলে চিত্ত পরিশুদ্ধ করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন আত্মসংযম। আত্মসংযমের জন্য যোগাভ্যাসের উপদেশ দিয়েছেন। যোগের প্রকৃত অর্থ হল বৈষয়িক কাজের মধ্যে থেকেও সবসময় ঈশ্বরকে স্মরণ করা। যুক্তি বা বুদ্ধির চরম পরিণতি হল স্বজ্ঞা। স্বজ্ঞার মাধ্যমেই অসীম, অখণ্ড জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু প্রধান কথা সহজ জ্ঞান বা স্বজ্ঞা। এই জ্ঞান নিরবলম্ব। এই স্বজ্ঞার ওপরেই রাজনারায়ণ বসু বেশি জোর দিয়েছিলেন। এরপর তিনি আত্মপ্রত্যয়ের ওপরেও জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে অলৌকিক ঈশ্বরকে যে স্বজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় তা হল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। তা হল আত্মার সঙ্গে আত্মার আধ্যাত্মিক সংযোগ। স্বজ্ঞার ওপর তিনি বেশি জোর দিলেও জ্ঞান বা বুদ্ধিকে একেবারে উপেক্ষা করেননি। তাঁর মতে জ্ঞান ও বুদ্ধি ব্যতীত নিছক অনুভূতি হল শূন্যগর্ভ। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে চরম তত্ত্ব বা বিশ্বের আদি কারণের বিষয়ে জানার পক্ষে রাজনারায়ণ জোর দিয়েছিলেন ইন্দ্রিয়াতীত প্রজ্ঞার ওপর। রাজনারায়ণের মতে যে ধর্মের বিজ্ঞান ভিত্তি আছে, দার্শনিক সত্য আছে, সে ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই। তাঁর ধর্মচিন্তায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে তাঁর এই চিন্তাধারার বিশেষ মূল্য আছে। তাঁর প্রজ্ঞালোকেই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মূল সুর লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে তর্ক আলোচনা নয়, ভক্তির আবেগ-উচ্ছলতা নয়, প্রত্যয়ের অন্ধ অনুসরণ নয়, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য বিধান হলেই অন্তরে পূর্ণ জ্ঞান জাগ্রত হয়ে পূর্ণজ্যোতির উদয় হবে। মানবজাতি মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। ধর্মচিন্তাকে তিনি জাতীয়তাবোধ বিকাশের পরিপূরকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয়ভাবে প্রবুদ্ধ হয়েই রাজনারায়ণ বসু ধর্মচর্চা ও দর্শনচিন্তা করেছিলেন। ভারতীয় জীবনাদর্শের মূল সুরটি স্মরণ করেই তিনি নব্য হিন্দুধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি - জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ধর্মসাধনের উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মত ছিল ধর্মমত অপেক্ষা ধর্মের ওপরেই জোর দেওয়া উচিত।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশ প্রেমমন্ত্রের দীক্ষাগুরু। সেই মন্ত্রের সাধন তিনি করেছেন আজীবন। বোধহয় রাজনারায়ণের বাণীও সুদূর নয়, অনতিদূর যুগান্তরেই অরবিন্দ ও বিবেকানন্দের মধ্যে অস্ফূটভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর স্বদেশচিন্তায় ভারতীয় হিন্দুত্বের যে মহান আদর্শ ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানে ও কর্মে সেই আদর্শেরই মহিমান্বিত প্রকাশ দেখা গিয়েছে। এই দুই মহামণীষী প্রত্যক্ষভাবে রাজনারায়ণের চিন্তা ও কর্মধারার অনুসরণ হয়তো করেননি, কিন্তু তাঁর মনে অস্ফূটভাবে যে ভাব অঙ্কুরিত হয় বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে তারই মহীরূহ রূপ প্রকাশিত হয়েছে বলে অনুমান করা যেতেই পারে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ১৩৫৪।
২. বাগল, যোগেশচন্দ্র, জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ, কলকাতা, ১৩৫৩।
৩. বসু, রাজনারায়ণ, সে কাল আর এ কাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৩।
৪. বসু, রাজনারায়ণ (সম্পাদিত), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খণ্ড), সমাজ সংস্কার, ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং, কলকাতা, ১২৮৯।

৫. বসু, রাজনারায়ণ, গ্রাম্য উপাখ্যান, কুন্তলীন প্রেস, কলকাতা, ১৯১৪।

৬. বসু, রাজনারায়ণ, আত্মচরিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৬১।

৭. বসু, রাজনারায়ণ, ধর্মতত্ত্বদীপিকা, পৃষ্ঠা ৩, ১৮-১৯, ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ।

৮. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, ১৯৫৭।

৯. সেন, সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

পত্রিকা:

১. ঋষিজীবন', পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী, পৃষ্ঠা- ১১১, আশ্বিন, ১৮০৯ শকাব্দ।

২. 'জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালী জাতি', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৃষ্ঠা- ১০, বৈশাখ, ১৮০২ শকাব্দ।

৩. পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী, পৃষ্ঠা- ৭১, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৭৭০ শকাব্দ।

৪. পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী, পৃষ্ঠা- ৩৪, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৮০২ শকাব্দ।

৫. বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, পৃষ্ঠা - ১১৬, কার্তিক সংখ্যা, ১৩২৪।

৬. স্বদেশীয় অনুশীলন, পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী, পৃষ্ঠা- ১২৬, কার্তিক সংখ্যা, ১৭৯৮।

৭. পত্রিকা, দাসী, পৃষ্ঠা- ৬৪৭, ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

৮. পত্রিকা, দাসী, পৃষ্ঠা- ৬৪৮, ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

৯. ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা- দ্বিতীয়ভাগ, পৃষ্ঠা - ৭, ১৭৯২ শকাব্দ।

১০. পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী, পৃষ্ঠা- ১৮৩, পৌষ ১৮১৪ শকাব্দ।